প্রাক্‌কথন

জন্মসূত্রে উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা হওয়ার সুবাদে শৈশব থেকেই এই অঞ্চলের বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে সুপরিচিত। এরপর উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগে স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে পড়াশোনা করার সময় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর (আর্য, অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, ভোটবর্মী) বন্ধু-বান্ধবীদের সান্নিধ্যে আসি। ধীরে ধীরে তাদের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি আমাকে আকৃষ্ট করে। বলা যেতে পারে খুবই পরিচিত নাম 'নকশালবাড়ি', অন্যদিকে খুবই অপরিচিত নাম 'ধিমাল'। এই অপরিচিত নামের সঙ্গে পরিচিত নামের মেলবন্ধনের উদ্দেশ্যেই আমার গবেষণা কর্মটির সূত্রপাত। অন্যদিকে জাতি ও ভাষা হিসেবে ধিমাল বিপন্ন বা লুপ্তপ্রায় সেদিক থেকে বিষয়টিকে গবেষণার বিষয় হিসেবে নির্বাচন করার গুরুত্ব আলাদা। এ যেন নষ্টোদ্ধারের কাজ। তাই বাংলা ভাষার সঙ্গে ধিমাল ভাষার তুলনামূলক আলোচনা এত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে।

স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম (২০০৮) শেষ করে এম.ফিল কোর্সে ভর্ত্তি হই এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. দীপক কুমার রায়ের পরামর্শে এম.ফিল অভিসন্দর্ভের বিষয় হিসেবে 'ধিমাল জাতি ও তার সংস্কৃতি ' শিরোনামটি গ্রহণ করি। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অন্তর্গত রাজীব গান্ধী জাতীয় বৃত্তি NO. F. 14-2 (SC)/2008 (SA-III) লাভ করে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হই। সেই থেকেই শুরু ধিমাল-ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করার কাজ। এম.ফিল অভিসন্দর্ভের শিরোনামটি গ্রহণ করার সময়ে ধিমাল সংস্কৃতিকে বেছে নেই। ২০১০ সালে এম.ফিল সম্পন্ন করে পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য 'ধিমাল ভাষা ও সাহিত্য: একটি সমীক্ষা' শিরোনামটিকে নির্বাচন করি।

দীর্ঘ ছ'বছর ধরে উত্তরবঙ্গ ও নেপালের তরাই অঞ্চলে গিয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষায় যাঁদের সহযোগিতা ও সাহায্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে পেয়েছি, সেই সমস্ত অগণিত সহায় সম্বলহীন ধিমাল মানুষদের সর্বাগ্রে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। যাঁরা আমার পরম আত্মীয়ের মত। যেভাবে তাঁরা আমাকে তথ্য সংগ্রহ করতে সাহায্য করেছেন, তাতে আমি তাঁদের প্রতি চিরঋণী।

'ধিমাল অস্তিত্ব রক্ষা সমিতি' (ভারত) এবং 'ধিমাল জাতি বিকাশ কেন্দ্র' (নেপাল) এর কর্ম কর্তাদের ব্যবহারে আমি মুগ্ধ, তাঁরা বিভিন্ন সময়ে বহু গ্রন্থসহ নানা তথ্য সরবরাহ করে গবেষণাকর্মের দুরূহতাকে সহজ করে দিয়েছেন। আমার গবেষণা কর্মটির অগ্রগতির খোঁজ খবর নিয়েছেন।

ভারতীয় ধিমালদের মধ্যে গর্জন কুমার মল্লিক মহাশয় এবং তাঁর স্ত্রী অলকা মল্লিককে

আলাদা করে বলাবাহুল্য হবে। দীর্ঘ ছ'বছরের ক্ষেত্রসমীক্ষাকালে বহুবার তাঁদের বাড়িতে পরম আত্মীয়ের মতই থেকেছি, বিরক্ত করেছি, তাঁরা তাঁদের কর্ম ব্যস্ততার মাঝেও আমাকে যেভাবে সময় দিয়েছেন সেকথা ভোলার নয়। বর্তমানে গর্জন মল্লিকের স্ত্রী মারণ রোগে শয্যাশায়ী, সেই মাতৃতুল্য কাকিমার কথা মনে পড়লে মন খারাপ হয়ে যায়। তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করা ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই।

এছাড়াও শিউবর জোতের মালবর মল্লিক ও তার স্ত্রী, কিষ্ট মল্লিক ও তার স্ত্রী, শেওড়ি মল্লিক এবং খুদন মল্লিক, বিকাশ মল্লিক, প্রসেনজিৎ মল্লিক বিভিন্ন সময়ে আমাকে নানা প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করেছেন, তাঁদেরকে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমার সহপাঠী হরদেব মল্লিক (ধিমাল), সত্যেন মল্লিক (ধিমাল) এবং আমি তিনজন মিলে ২০১০ সালের মে মাসে ভারতীয় ধিমালদের প্রতিটি জোতের প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষা করেছি। ওদের সাহায্য না পেলে এই সমীক্ষা দুঃসাধ্য ছিল। ওদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এছাড়াও পাঁচ দিন চার রাত ধরে লোকসংস্কৃতিবিদ্ পল্লব সেনগুপ্তের পরামর্শে ধিমাল জনগোষ্ঠীর পাঁচ জনকে সঙ্গে নিয়ে ধিমাল ভাষায় প্রচলিত নয়টি লোককথার বাংলা ভাষায় রূপান্তরের কাজ সম্পন্ন করি এবং সেই সঙ্গে ধিমাল ভাষাতেও এই সব মৌখিক লোককথা লিখিত রূপদান করি। তাই তাদেরকে আমার কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা নেই। সেই সঙ্গে লোকসংস্কৃতিবিদ্ পল্লব সেনগুপ্তকেও সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই।

নেপালের ধিমালদের মধ্যে সর্বাগ্রে ধুলাবাড়ি নিবাসী পাত্র ধিমাল এবং তার স্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। পাত্র ধিমালের সঙ্গে বিভিন্ন সময় ধিমালদের ভাষা-সংস্কৃতি নিয়ে বিতর্ক হয়েছে, মত পার্থক্য হয়েছে, তার জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় আমি উপকৃত হয়েছি। তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

এছাড়াও নেপালের ধিমালদের মধ্যে নবীন লেখক সোম ধিমালের সঙ্গেও বিভিন্ন সময়ে নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, তাতেও কম উপকৃত হইনি। তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

গবেষণা কর্মের পরিকল্পনায় এবং প্রতিটি পদক্ষেপে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে আমাকে দিক্ নির্দেশ করেছেন আমার তত্ত্বাবধায়ক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক সুবোধকুমার যশ মহাশয়। এছাড়াও তাঁর 'সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বাংলা ও নেপালি শব্দার্থ সমীক্ষা' গ্রন্থটির দ্বারা প্রভূত উপকৃত হয়েছি। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

গবেষণা পর্বে প্রয়োজনীয় উপদেশ ও পরামর্শ দিয়েছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক এবং 'আঞ্চলিক ভাষা সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের' অধিকর্তা ড. নিখিলেশ রায় মহাশয়। বিভিন্ন সময়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় আঞ্চলিক ভাষা-সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের উদ্যোগে

আয়োজিত বিভিন্ন জাতি-জনজাতির ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কিত আলোচনা সভা এবং কর্মশালা গুলির দ্বারা প্রভূত উপকৃত হয়েছি। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

গবেষণাকর্ম সম্পর্কে প্রতিনিয়ত প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক দীপক কুমার রায় মহাশয়। তাঁর বিভিন্ন জাতি-জনজাতি সম্পর্কিত গভীর জ্ঞান ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন আলোচনা গবেষণাকর্মটিকে অন্য মাত্রা দান করতে সাহায্য করেছে। এছাড়াও তাঁর 'বাংলা ও বোড়ো ভাষার তুলনামূলক অধ্যয়ন' বিষয়ক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি (অপ্রকাশিত) নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দিক্ নির্দেশ করতে সাহায্য করেছে। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

এছাড়াও যাঁরা আমার গবেষণাকর্মে প্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়েছেন তাঁরা হলেন বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা মঞ্জুলা বেরা মহাশয়া, বর্তমান বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক উৎপল মণ্ডল মহাশয় এবং অধ্যাপক তপন মণ্ডল মহাশয়। তাঁদের সস্নেহ পরামর্শ গবেষণাকর্মটিকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করেছে। তাঁদেরকে আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

শিক্ষায়তনের বাইরে সব থেকে বেশি যাঁর দ্বারা উপকৃত হয়েছি, তিনি হলেন পেশায় শিক্ষক আমার দাদা প্রদীপ সিংহ রায়। তিনি শুধু গবেষণাকর্মে আমাকে উৎসাহ ও পরামর্শই দেননি; বিভিন্ন সময়ে ভাষা-সাহিত্য বিষয়ে তার সঙ্গে আমার তুমুল বিতর্ক হয়েছে এবং এখনও হয়। তাঁর জ্ঞানগর্ভ গভীর আলোচনা নিঃসন্দেহে আমার গবেষণাকর্মটিকে সমৃদ্ধ করেছে। সেই সঙ্গে বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করে দিয়ে আমার গবেষণাকর্মকে সহজ করে দিয়েছে। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করতে চাই না।

এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে গবেষণাকর্ম বিষয়ে যাঁদের পরামর্শ পেয়ে উপকৃত হয়েছি তাঁরা হলেন— টোটো ও সাদরী ভাষার গবেষক বিমলেন্দু মজুমদার মহাশয়, সুধীরকুমার বিষ্ণু মহাশয়, অসমের দ্বিজেন্দ্রনাথ ভকত, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী গ্রন্থাগারিক পরিমল রায়, সাপটগ্রাম মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক রীতা মালাকার প্রমুখ। এঁদের সকলের কাছেই আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা রইল।

ক্ষেত্রসমীক্ষার পাশাপাশি যে সকল প্রতিষ্ঠান আমাকে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ ও নানা তথ্য দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— এশিয়াটিক সোসাইটি (কোলকাতা) ন্যাশনাল লাইব্রেরি (কোলকাতা), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ (কোলকাতা), উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, সাপটগ্রাম মহাবিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কোচবিহার স্টেট লাইব্রেরি, জলপাইগুড়ি জেলা গ্রন্থাগার এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় আঞ্চলিক ভাষা-সাংস্কৃতিক চর্চা কেন্দ্র

প্রভৃতি। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত প্রয়োজনীয় দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ এবং নানা তথ্য আমার গবেষণাকর্মে সহায়ক হয়েছে। এখানকার প্রাতিষ্ঠানিক কর্তাব্যক্তিদের প্রতিও রইল আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা।

আমার সদাসঙ্গী মৌসুমী বিভিন্ন সময়ে নানা অসুবিধার মধ্যে থেকেও গবেষণা অভিসন্দর্ভটির প্রুফ সংশোধনসহ প্রয়োজনীয় নানা কাজে সাহায্য করেছে। আমি তার সাফল্য কামনা করি।

বর্ণসংস্থাপন ও অক্ষর বিন্যাসে সাহায্য করেছে আমার প্রিয় ভাইপো সুজিৎ। এমনিতেই ভাষার কাজের বর্ণসংস্থাপন ও অক্ষর বিন্যাস খুবই ঝামেলার, তা সত্ত্বেও বহুবার পাণ্ডুলিপি মুদ্রণ ও সংশোধন কর্মে সময় দিয়ে আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভের অবয়ব দান করেছে সে। আমি তার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

সর্বোপরি যাঁদের আশীর্বাদ পাথেয় করে আজ এই পর্যন্ত আসতে পেরেছি, আমার পরলোকগত বাবা ও মা আজ তাঁরা যেখানেই থাকুক না কেন তাঁদের জানাই শতকোটি প্রণাম।

তারিখ : ০৩/02/202৫

বিশ্বজিৎ রায়

বিশ্বজিৎ রায়